দুঃস্বপ্নের দুইরাত্রি

সুশান্ত ভট্টাচার্য্য

[পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহণে স্যান্টো (সুশান্ত ভট্টাচার্য) ভীষণ পরিচিত নাম। পেশায় ডাক্তার। পর্বতারোহী তকমার বাইরে সার্বিকভাবে নিজেকে ট্রাভেলার রূপে দেখতে চান। এভারেস্ট সহ বহু অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। ৯ টি পর্বত আরোহণ করেছেন। এককথায় প্রকৃতিপ্রেমিক অ্যাডভেঞ্চারাস মানুষ।]

প্রতিদিন মেঘেদের একই খেলা, কামেট আর মানাকে নিয়ে। যেই ঘড়িতে আড়াইটে বাজবে, তিব্বতের দিক থেকে বিশাল মেঘের এক জমাট সোহাগ ধীরে এগিয়ে আসবে কামেটের সামান্য হেলে থাকা, পঁচিশ হাজার ফুট উঁচু তামাটে ঔদ্ধত্যের পিছনে। এর পর সেই পুঞ্জীভূত মেঘ কামেটের গা আঁকড়ে ভেসে ভেসে উঠতে থাকবে শীর্ষের লক্ষ্যে। চূড়োয় পৌঁছাবার পর আরও দুরন্ত খেলা! মেঘেদের সঘন শুভ্রতা শিখরে পৌঁছে শতধা বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, যেন শীর্ষজয়ের নির্বাক উল্লাস। এ উল্লাস প্রগলভ নয়। মেঘেদের রূপান্তর ঘটবে সহিষ্ণু পক্ষসঞ্চারে। আর আশ্চর্য্য, ছড়িয়ে পড়া মেঘের হাজারো টুকরো এরপর একসাথে ধীরে ধীরে এগোবে মানা শিখরের দিকে। যেন ওরা মানার মেঘদূত।

সামনে, প্রায় আধ কিলোমিটার দূরের দূরাতিক্রম্য গলিতে নিভে নিভে আসবে গলন্ত সোনা-রং। ফেলে আসা পথের দিকে বিধান, দেওবনের গিরিশরা আর কিরীটে জ্বলে উঠবে দিনান্তের আগুন। পড়ন্ত বেলায় কামেটের দীপ্তি ক্ষণিক অগ্নিভ হয়ে প্রতিফলিত হবে পূর্বি-কমেট হিমবাহের বিস্তারে, মানার শুভ্রতায়। নিঃসন্দেহে তখন বোঝা যায় কামেট কতটা সার্থকনামা। 'কামেট' শব্দটা তিব্বতি 'কাংমে'-র পরিবর্তিত রূপ, যার অর্থ 'হিমবাহের আগুন'। কামেটের চুড়ো থেকে ফোয়ারার মত মেঘ মানার শীর্ষকে জড়িয়ে ধরবে আর মাথার ওপর বেলা চারটের ঝলসানো সূর্য ধীরে মুখ লুকাবে। শ্বেতসুন্দরী মানার বিশাল দেহের দীঘল ছায়া ঢেকে দেবে পূর্বিকামেট হিমবাহের ক্রিভাস-কোঁকড়ানো সাদা রাজপথ। সে ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে তরঙ্গসংকুল, সর্পিল হিমবাহের প্রবাহপথে। এ যেন দিনের সহাস্য প্রকৃতির সর্বাঙ্গে ক্রীড়ারত সদাচঞ্চল সপ্তাশ্বকে হারাবার আকস্মিক বিমর্ষতা।

এটা কুহেলির আড়ালে লুকোচুরি খেলা নীলাচঞ্চল হিমাচল নয়, জীবন-স্পন্দনে মুখর সিক্ত-শ্যামল কুমায়ুন নয়, অরণ্যশোভিত সিকিম হিমালয় নয়; এমনকি আমার নজরে সৌম্য, ধ্যানমৌন চেনা গাড়োয়াল নয়। এখানে ঊষর, নগ্ন তিব্বতের নির্মমতা এসে গ্রাস করেছে গাড়োয়ালকে।

এ সময় পঞ্চাশ ফুট নিচে, মানা হিমবাহের পার্শ্ব-গ্রাবরেখা ঘেঁসে থাকা আমাদের তিন নাম্বার ক্যাম্পের একমাত্র খাবার জলের উৎস সেই 'গ্লেসিয়্যালটার্ন্'-টা জমে পাথর হয়ে যায়। পাঁচ কিলো ওজনের বোল্ডার ছুঁড়ে মারলেও যাকে সহজে ফাটানো যায়না। এটাই আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়বার সময়। ঠিক এরপরই মিডেস কল পেরিয়ে আসা তিব্বতের হাড় হিম করা বাতাস প্রলয় নৃত্য শুরু করবে পূর্বি-কামেট হিমবাহ-বেসিনের চৌহদ্দি জুড়ে। তার ওপর আরো বিপদের সংকেত। শীত আসছে। বসুধারা তাল থেকে যে বন্ধুর পথ ধরে কামেটের গহনতর সান্নিধ্যে উঠে এসেছি; তুষারপাত শুরু হয়ে গেলে সে পথে ফেরা

বিপদজনক হয়ে উঠবে। মাত্র ক'বছর আগে এত অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় শীত এসেছিল যে, এ পথের শেষ গ্রাম নিতি থেকে জনে জনে গ্রামবাসীকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছিল ইন্দো-তিব্বত-সীমান্ত-রক্ষীদের হেলিকপ্টার।

আসবার সময় নিজের চোখেই দেখে এসেছি; আসন্ন শীতের আশঙ্কায় নিতি গাঁয়ের বাসিন্দারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে নেমে যাবার তোড়জোড় শুরু করেছে। ফসলের মরসুম শেষ। কড়াইশুঁটি, শালগম, সর্ষে, ফাঁফর, রামদানা, রাই, ইত্যাদি তুলে, ঝেড়ে-বেছে তড়িঘড়ি বস্তাবন্দি করা হচ্ছে নিচে নামাবার জন্যে। আমার পাতানো বোন বর্খা ফুনিয়া ঘরের উনুনের পাশে বসে নানান কথার মাঝখানে নিজের দুশ্চিন্তার কথা কবুল করেছিল, 'অওর বিস দিন ইহাঁ ঠহর্ না মত্তৎ সে খেল্নে কি বরাবর হোগি ভাইয়া।'

হয়ত এরকম আতঙ্কের গন্ধ পেয়েই আমাদের দলের আরোহী জসবির সিং হুন্-জন দু'নাম্বার ক্যাম্পের এক সন্ধ্যায় দলনেতা গৌতমের সঙ্গে ওর মতান্তর ও মনোমালিন্য ইত্যাদিকে ফিরে যাবার অজুহাত হিসেবে পেশ করেছিল। অন্য সবার কাছে যা-ই হোক না কেন, আসল সত্যিটা সবার আড়ালে জসবির একান্তে আমাকেই বলেছিল, একেবারে দেশি কায়দায়, 'ইয়ে তো গড়কি বিচ্ বিল্লি কা সর ফসাঁওনবালি বাত হোগি।' অর্থাৎ, এ-তো ঘড়ার ভেতর বেড়ালের মাথা আটকে যাবার মত বিপত্তি হতে চলেছে। মর্মার্থটা প্রাঞ্জল; যে পথ ধরে কামেটের অন্দরে ঢুকে পড়েছি, তুষারপাত শুরু হয়ে গেলে সে পথে ফেরা মুশকিল হয়ে যাবে। এবারে, এই অঞ্চলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও আসন্ন ক'দিনে প্রবল তুষারপাতের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে আশঙ্কা ব্যাপারটা পাহাড়ে রীতিমতো সংক্রামক বলে এসব কাউকে বলিনি, কিন্তু মিডেস কল পর্যন্ত ওঠার ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকলেও আমি কপালদোষেই আটকে পড়েছি তিন নম্বর ক্যাম্পে। নিস্করুণ, জনহীন এক পরিবেশে, পাষাণ আর তুষারের রুক্ষ, শীতল সাম্রাজ্যে আমি একদম একা হয়ে গেছি। কপালদোষ না বলে অবশ্য নিজের ভুল বলাটাই সঙ্গত।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০০। দুপুরে আমি আর গৌতম তিন নম্বর ক্যাম্পের চারপাশ ঘুরে দেখছিলাম। আমাদের শেরপারা, অর্থাৎ কামি, টেন্ডি এবং তাশি ইতিমধ্যে চার নম্বর শিবির খাড়া করে ফেলেছে। ৩০ তারিখ সকালেই তাশি নেমে এসেছে তিন নং ক্যাম্পে। কামি এবং টেন্ডি পাঁচ-নম্বর ক্যাম্পের 'রুট ওপেন' করার চেষ্টা চালাচ্ছে। দু-নম্বর ক্যাম্প থেকে বলবির উঠে এসেছে তিন-নম্বর ক্যাম্পে। তিন নম্বর ক্যাম্পে খাবার খুব একটা বেশি নেই, কিন্তু গৌতমের নির্দেশ ছিল দু-তিন দিনের মধ্যেই দু'নম্বর ক্যাম্প থেকে তপন সুধা কিংবা অমিত আমাদের কুক নারায়ণকে সঙ্গে করে রসদ নিয়ে তিন-নম্বর ক্যাম্পে উঠে আসবে।

আধ কিলোমিটার দূরে গালি-টার কাছাকাছি একটা ক্যাম্প-সাইট দেখতে পেয়েছি। ওটা অনেক আগের ব্যবহৃত একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। তখনো দু'তিনটে বোল্ডারে তাঁবু খাটাবার জীর্ণ নাইলনের দড়ি লাগানো ছিল। ঐ শিবির প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা একটা ল্যামিনেট করা পরিচয়পত্র থেকে অবগত হলাম যে ওটা গুজরাটের কোনো মহিলা অভিযাত্রী সংগঠনের পরিত্যক্ত ক্যাম্প-সাইট। তবে সেখানে অভিযানের সালের উল্লেখ ছিলনা। ওখানেই পড়ে ছিল প্লাস্টিকের একটা বড়সড় কাপ। গৌতম রসিকতা করে বলল, 'রেখে দাও ডাক্তার, ওটা নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্ক-স্মাইথের ব্যক্তিগত চায়ের কাপ।' আরও একটা গুপ্তধন আমার চোখ এড়ায়নি। ঐ পরিত্যক্ত ক্যাম্প-সাইট থেকে কিছুটা দূরেই পাথরের আড়ালে ফেলে রাখা প্রায় কুড়ি খানা চিকেন কিউব। ওগুলো গরম জলে মিশিয়ে চিকেন স্যুপ তৈরি করা যায়। কিউবের মোড়কগুলো তখনো অটুট। আমি গৌতমের নজর এড়িয়ে পাঁচ-ছ'খানা কিউব পকেটস্থ করেছি।

হাতসাফাই করবার কারণ ছিল। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ কামি দাজু ধর্মপ্রাণ শেরপা। ওর কথামতো আসানসোল থেকেই গৌতম ঠিক করেছে যে আমাদের অভিযানের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ নিরামিষ হবে। অভিযান শেষ হলে ফেরার পথে নিতি গাঁয়ে নন্দাদেবীর মন্দিরে পুজো আর পাঁঠাবলি দিয়ে তারপর মাংস খাওয়া। সুতরাং খিচুড়ি, চাউমিন, রোটি-সবজির ওপরই অভিযান চলছে (কে জানে, ওটাও জসবিরের ফিরে যাবার কারণ কিনা)। আমার মতো আমিষাসক্ত লোকের কাছে এ্যাদ্দিন বৈধব্যের পর চিকেন কিউবগুলোকে রীতিমতো নন্দাদেবীর দান মনে হয়েছে। ক্যাম্পে ফিরে এসে আমি গরম জলে চারটে কিউব মিশিয়ে গৌতমের ঐ 'ফ্র্যাঙ্ক-স্মাইথের কাপ'-এ আয়েশ করে খেয়েছি, বলা বাহুল্য, এবারও সবার নজর এড়িয়ে।

অতিলোভের প্রতিক্রিয়া সন্ধ্যে থেকেই টের পেয়েছি। পেট কামড়ে ব্যথা, শীত শীত করে জ্বর এবং গা গোলানো। অতঃপর বমি এবং দাস্ত। রাতে খাওয়ার আর ইচ্ছে ছিল না। গৌতম উৎকণ্ঠিত ছিল। আমি অসুস্থতাটা স্বীকার করেছি, কিন্তু নেপথ্যের কারণটা ঘুণাক্ষরেও ফাঁস করিনি। রাতে অসহ্য শীত উপেক্ষা করে পাঁচবার তাঁবুর বাইরে গেছি। নিঃসন্দেহে 'ফুড পয়জনিং।'

পরদিন, অর্থাৎ পয়লা অক্টোবর আমাদের যাবার কথা চার নম্বর ক্যাম্পে। ঝকঝকে আবহাওয়াতে সকাল সাতটায় গৌতম, অরুপম, বলবির, তাশি আর মিংমা তৈরি হয়েছে ওপরে যাবার জন্যে, আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। দুর্বলতার জন্যে দাঁড়াতে পারছি না, খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। এদিকে আমার এই অবস্থায় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রগুলোও ভুল করে ফেলে এসেছি দু'নম্বর ক্যাম্পে। আমার দশা দেখে গৌতম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 'তুমি এখানেই রেস্ট নাও। আমি মিংমাকে কাল কিংবা পরশু পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমায় নিয়ে আপার ক্যাম্পে উঠে আসার জন্য। ততক্ষণে দু'নম্বর ক্যাম্প থেকে অমিত, সুধা, তপন কিংবা নারায়ন উঠে আসবে এখানে।'

তিন নম্বর ক্যাম্প থেকে প্রায় সব রসদই উঠে গেছে আপার ক্যাম্পের জন্যে, আমার জন্যে পড়ে আছে কিছু চাল, ডাল, আলু আর সামান্য মশলাপাতি। রান্নার ব্যাপারে আমি একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস। সবাইকে গালি-টা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে আমি অরূপমের কাছে খিচুড়ির ফর্মুলাটা জানতে চেয়েছি। অরূপম সহজ উত্তর দিয়েছে, 'যত চাল নেবে, তার দেড়গুণ ডাল মিশিয়ে একটু বেশি জল দিয়ে চড়িয়ে দিও।' গৌতমরা গালির অর্ধেক দৈর্ঘ্য উঠে যাবার পর আমি ফিরে এসেছি ক্যাম্পে। হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। ফেরার পথে দু'বার বমি করেছি। ভাগ্যিস বলবির জেরিক্যানে কিছুটা জল রেখে গেছে; নইলে মোরেন বেয়ে গ্লেসিয়্যাল লেকটা পর্যন্ত নামা প্রাণান্তকর হত। যদি ক্যাম্প দুই থেকে আজ কেউ উঠে না আসে, আজ রাত আমায় একাই কাটাতে হবে। তাঁবুর বাইরে বসে কিছুক্ষণ ডায়েরি লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই ভালো লাগছিল না। এই নিয়ে মোট বারোবার টয়লেট যেতে হয়েছে। বমি আর জ্বরজ্বর ভাবটাও রয়ে গেছে। খাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও ব্যবস্থা তো করতেই হবে। হওয়ার দমক বাড়তেই আমি প্রেসার কুকারে চাল, ডাল আর জল নিয়ে রান্নায় বসে গেছি।

অরূপমের বলাটা যত সহজ ছিল, কাজটা ততোধিক কঠিন। বিপত্তির পর বিপত্তি। কুকারের গ্যাসকেটটা দুর্বল ছিল। টানা-হ্যাঁচড়া করে লাগাতে যেতেই ওটা ছিঁড়ে এসেছে। স্টোভের ওয়াশারটা ঢিলে হয়ে পাম্পের জোর কমে গেছে। অনেক কসরৎ করে যদিবা জ্বালানো যাচ্ছে, কিচেনের কড়িবরগা নাড়িয়ে দেয়া হাওয়ায় দমকে বার তিন নিভে গেছে স্টোভ। নিজেকেই অভিশাপ দিচ্ছি কেন পাহাড়ে কোনওদিন রান্না

করবার চেষ্টা করিনি। ঘন্টা দেড়েক চেষ্টা করে দুচ্ছাই বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি। তবে কিচেনের মধ্যেই কপালজোরে একটা কেসি-দাসের রসগোল্লার টিন খুঁজে পেয়েছি। আমি ওই টিন আর জলের বোতল নিয়ে আমার ওয়ান-ম্যান ডানলপ তাঁবুতে ঢুকে পড়েছি।

হিমালয়ের আকাশে রাত নামলেই দেওয়ালি! অনন্ত আকাশের রেশমি-কালো সমুদ্দুরে ভেসে যায় লক্ষ নক্ষত্র আর জ্যোৎস্নার মায়া। সেই মায়াবী আলো বিধান, দেওবন, মানা আর কামটের শুভ্র প্রাচীরে ছুঁয়ে কোন অজানায় যেন মিশে যায়। স্বপ্নের চেয়েও স্বপ্নময়, অলীক এই ছবি চোখ ভরে দেখবার সাহস হয়নি আজ। কিছু সুযোগসন্ধানী অতিথি বুঝেছে যে, ক্যাম্পে আমি একা! এই তিন নম্বর ক্যাম্পের আশেপাশে চতুষ্পদের পায়ের ছাপ দেখেছি প্রচুর। ছোট ছোট ওই ছাপগুলো আমার চেনা, ওগুলো স্নো-ফক্সদের পায়ের ছাপ। কিন্তু বড় বড় বোল্ডারের গা ঘেঁষে আরো বড় ছাপ এই প্রথম দেখেছি। প্রথম দেখলেও সন্দেহ ছিলনা যে ওগুলো স্নো-লেপার্ডের পদচিহ্ন। টেন্ডি শেরপাও একনজর দেখেই রায় দিয়েছিল, 'ইউ চিতা-হি হ্যায়!'

এরা কাছাকাছিই ঘুরছে। গা-ঢাকা দিয়ে, ধূর্ত পদক্ষেপে। আজ রাতে এদের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়িয়েছে। কিচেন তাঁবুর ভেতরে মাঝে মধ্যেই বাসনপত্র গড়িয়ে যাবার শব্দ। এরা যতই 'ইল্যুসিভ' হোক, মানুষকে যতই এড়িয়ে চলুক; রাতে, একা, এই অদ্ভুত অচেনা পরিবেশে, এদেরই সঙ্গে সহবাস কখনওই স্বস্তির নয়। সাহসে ভর করে তাঁবুর বাইরে উঁকি দিয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছে। এই-তো হাত পাঁচেক দূরে কিচেন তাঁবুর অন্ধকারে একজোড়া জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ আমার দিকেই স্থির! বুঝলাম, সংস্কৃতে কেন বিড়ালের আরেক নাম দীপ্তাক্ষ!

হঠাৎ বেশ খিদে পায়। স্যুইস নাইফ দিয়ে রসগোল্লার টিন কেটে পাঁচটা রসগোল্লা আর জল খেয়ে স্থানুবৎ স্লিপিং ব্যাগের ভেতর পড়ে রইলাম। কিন্তু ঘুমোনো অসম্ভব। একা থাকবার ভয়টা আমায় গ্রাস করেছে। অথচ আমি তো তৈরিই ছিলাম। রাতে পাহাড়ে অনেক রকম শব্দ শুনতে পাবো, সব কিছু উপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু, যে সব শব্দ রাতভর শুনতে পেয়েছি, এত রকমারি আওয়াজ কখনও শুনিনি। শক্ত বরফে কিছু যেন পিছলে যাচ্ছে; মনে হল, কেউ কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পিঠের তলায় মাঝেমধ্যেই ঠং, ঠাঁই, ঠাস্ শব্দে হিমবাহে চিড় ধরছে যেন! পূবদিকের দেওয়ালে পাথর গড়ানো দুমদাম, তাঁবুর চালা কাঁপিয়ে বাতাসের তীব্র দমক, রাতজাগা রাভেন কিংবা চফের তাঁবু ঘেঁষে উড়ে যাওয়ার আওয়াজ। শুনলে অবিকল মনে হয় কেউ হাঁড়ির ভেতর জোর নিঃশ্বাস ফেলছে। সঙ্গে কিচেন তাঁবুর ভেতর দক্ষযজ্ঞ।

বেশ কিছুক্ষণ আঙুলে দু'কান চেপে, স্লিপিং ব্যাগ মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। ঘুম আর আসেনি। ফ্লাইয়ের ফাঁক দিয়ে আমার রাতজাগা চোখের সামনেই ভোরের নরম আলো জেগেছে। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চরাচর। কিছুক্ষণ বৃথা ঘুমোবার চেষ্টা করেছি। তারপর রোদের আলো শিবির-প্রাঙ্গণ ছুঁতেই আমি বেরিয়ে এসেছি। কিচেন তাঁবুতে গিয়ে সর্বনাশটা স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। চাল-ডাল-আলুর প্যাকেট ফর্দাফাই, যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে ক্যাম্পের লাস্ট রেশন। প্রেসার কুকুরটা উল্টে পড়ে গতদিনের ভেজানো চাল-ডাল কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে; সঙ্গে মিশেছে ওল্টানো স্টোভ থেকে চুঁইয়ে পড়া কেরোসিন তেল।

আজ যদি মিংমা নেমে না আসে? কিংবা দুনাম্বার ক্যাম্প থেকে কোনও 'রি-ইনফোর্সমেন্ট'? শুধু ভুখা থাকা নয়, একা থাকার আতঙ্কও রয়েছে। যদি কেউ না আসে? না, রসগোল্লাগুলো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একটা কাঁচা আলু নুন দিয়ে খাবার চেষ্টা করেছিলাম। আধখানা চিবোনোর পর আর ভক্তি হয়নি। তাছাড়া মাঝেমধ্যে পেটে একটা মোচড় এখনও আছে। মাটি থেকে চাল-ডাল তুলে যে আবার খিচুড়ি বানাবো, কুকার

ও স্টোভের কল্যাণে সেও অসম্ভব।

ভেবেছিলাম দেরিতে হলেও কেউ আসবে, কিন্তু দেখতে দেখতে চারটে বেজেছে। সব আশা উবে গেছে। তবে হ্যাঁ, টিনে এখনো পনেরোটা রসগোল্লা রয়েছে। ছ'টার সময় আরও পাঁচটা রসগোল্লা দিয়ে ডিনার সেরে টর্চ, ছুরি আর জলের বোতল মাথার পাশে রেখে শুয়ে পড়েছি। অন্ধকার নেমেছে। আমি বাইরের শব্দ উপেক্ষা কবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে চোখ বুজেছি। একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ দশদিক কাঁপানো বজ্রনাদ। মনে হল, গোটা পৃথিবীটা ভেঙে পড়েছে মাথায়। যেন এটাই মহাপ্রলয়ের দিন, বা ডুম্'স্ ডে!

এ পথে আসবার সময় পূর্বি-কামেট হিমবাহের ওপরে আমরা ঘনঘন অ্যাভালাঞ্চ হতে দেখেছি। প্রতিটিই বিধ্বংসী। কারণবশতই পূর্বি-কামেট হিমবাহের ডানদিক ধরে কোনও প্রথাগত পথ নেই। প্রায়ই হিমবাহের ওপারে কামেট বেসিনের মৌনতা ভৈরব গর্জনে খান্-খান করে নেমে আসবে বরফের ধ্বস। হিমবাহের বুকে ভীমবেগে আছেড়ে পড়েই বরফের প্রপাত ছিটকে উঠবে আকাশে, দিনের সূর্যকে ঢেকে দিয়ে। হিমবাহের বিস্তার পেরিয়ে বরফের মেঘ ঘিরে ঘিরে ধরবে এপারে আমাদের যাত্রাপথের চারপাশ। এরপর মুষলধারে বৃষ্টির মত মিনিট পাঁচেক বরফ-কুচির প্রবল বর্ষণ।

মানা পর্বতের অনেকটা ওপরে, আপাতদৃষ্টিতে চূড়োর কাছাকাছি একটা ভাঙাচোরা বরফের পেল্লাই দেওয়াল ঝুলে ছিল, হয়তো বহুকাল ধরেই ছিল। এমন ফাটা কপাল আমার, রাত-বারোটায় সেটাই ভেঙে পড়েছে! মনে হল যেন মহাশূন্য থেকে কক্ষচ্যুত কোনো মহাকায় অ্যাস্টেরয়েডের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘাতের অপরিমেয় তান্ডব। এটা আমার কাছে এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে প্রথমে ভেবেছি অ্যাভালাঞ্চটা সরাসরি আমার মাথার ওপর পড়েছে। ডানলপ তাঁবুর সংকীর্ণ আশ্রয়ে আমি দুহাতে মাথা চেপে উপুড় হয়ে অপেক্ষা করেছিলাম আসন্ন মৃত্যুর। ভুলে গিয়েছিলাম তাঁবু ছেড়ে বাইরে যেতে, ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি পূর্বি-কামেট হিমবাহের লেফট ল্যাটারাল মোরেনের নিরাপদ উচ্চতায় বিপদসীমার বাইরেই রয়েছি। সে যাই হোক, অ্যাভালাঞ্চের রুদ্রনাদের পনেরো মিনিট পর তাঁবুর ওপর ঝিরঝির তুষারপাতের শব্দ শুনে বুঝেছি, বেঁচে আছি।

তবু মুক্তি নেই। এরপরই শুরু হয় ভয়ধরানো হ্যালুসিনেশন। কিছুক্ষণ শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতেই স্পষ্ট শুনলাম আমার পাশেই, আমার তাঁবুতে কেউ 'মা, মা-গো' বলে স্লিপিং ব্যাগ সমেত পাশ ফিরে শুলো। এরপর ঘুম হয়?

আমি উঠে বসেছি। বসে ঝিমোচ্ছি। হঠাৎ শুনলাম, তাঁবুর দরজার পাশেই কে বলছে, 'কেউ আছিস'?

- 'কে?' আমি সম্মোহিতের মতো প্রশ্ন করেছি।

- 'আমি সুখেন্দু। উঠতে পারছি না।'

আমি অবসন্ন দেহে-মনেও বুঝতে পারছি যে আমি ভুল শুনছি, প্রলাপ বকছি। আমি সুখেন্দুকে কোনওদিন দেখিনি। শুধু শুনেছিলাম যে সেই কতকাল আগে মিডেস কলের কিছুটা ওপরে ক্রিভাসে পড়ে সুখেন্দুর মৃত্যু হয়েছিল, তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তন্দ্রাচ্ছন্ন দশায় রাতে আমি অসংলগ্ন কী কথা বিড়বিড় করে বলেছি, তা আজ আর মনে নেই; কিন্তু জানি যে কাউকে বলে বিশ্বাস করাতে পারবো না যে, সেই 'মা, মা-গো' বলা সেই আর্তকণ্ঠ, সুখেন্দুর সংলাপ কতটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম।

সারারাত এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে বসে বসেই কেটে গেছে। না, এরপর আর ভয় ছিল না, যেন আমি অসহয়তার সীমা অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয়, ভৌতিক পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ন সর্মপন করেছি।

কিন্তু ভোরের আলো ফোটার সঙ্গেই বিচার-বুদ্ধি ফিরেছে। বুঝেছি, এখানে আর একরাত্রি কাটালে আমার মানসিক ভারসাম্য থাকবে না।

এখান থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু এক কিলোমিটার দূরে পূর্বি-কামেট হিমবাহ হঠাৎ ঢালু হয়ে যাওয়ায় ওখানে 'প্রেশার জোন' তৈরি হয়েছে। জায়গাটা ক্রিভাসে ফুটিফাটা। অন্তত তিনটে গভীর ক্রিভাসের ফাঁদ পাতা আছে। সঙ্গে অন্তত একজন থাকলে বিপদে রিয়্যাক্ট করতে পারত; কিন্তু এখন ক্রিভাসে পড়ে গেলে পৃথিবীর কেউ আমার পরিণতির কথা জানবে না। মৃত্যুশীতল গহ্বরে আমাকে একাই শেষের অপেক্ষা করতে হবে!

এহেন একাকিত্বের অবিশ্বাস্য চাপ কাউকে বোঝানো যায় না। মনে হয়, জীবনে এক অদ্ভুত সীমান্তে এসে পৌঁছেছি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমিই একমাত্র জীবন্ত মানুষ। এ এক অন্তহীন শূন্যতা। ভালো করে হাঁটতে পারছিনা। জানিনা, মাথার অনেক ওপরে ঝুলন্ত আইসফল, খাড়া পাথর, বরফের দেয়াল আর ক্রিভাস-বিক্ষত পথ পেরিয়ে কামেট-শীর্ষের কতটা কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছে গৌতম, অরূপম, বলবির, কামি, টেন্ডি, পেম্বা, মিংমা আর তাশি। জানিনা, পেছনে দু'নাম্বার ক্যাম্পের আশ্রয়ে কেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে অমিত, সুধা আর তপন। কে জানে, অনেক নীচে বেস-ক্যাম্পে কতটা উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রহর গুনছে প্রশান্ত বর্মন। কেন কেউ আসছে না?

না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ব দু'নম্বর ক্যাম্পের লক্ষ্যে। কিন্তু শক্তি চাই। দেড়টার সময় আমি আরো পাঁচটা রসগোল্লা খেয়ে টিনের সবটুকু রস চুমুক দিয়ে শেষ করেছি। অবশিষ্ট পাঁচটা রসগোল্লা টিন সমেত স্যাকের সাইড-পকেটে পুরে, জল খেয়ে রুকস্যাক গুছিয়ে পিঠে তুলেছি। কপাল ভালো, আবহাওয়া পরিস্কার। আজও ভাবলে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয় সব। কীভাবে ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত শরীরে আমি ক্রিভাস-দীর্ণ হিমবাহের বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে বাঁদিকের বন্ধুর মোরেন-প্রাচীরে পা রেখেছি, শক্ত বরফ আর বোল্ডার-বোঝাই ভয়ঙ্কর পথে নিজেকে টানতে টানতে, টলতে টলতে পেরিয়েছি – তার আন্দাজ দেওয়া শক্ত।

সাড়ে চারটের সময় দূর থেকে দু'নম্বর ক্যাম্পের তাঁবুটা দেখতে পেয়েছি। তাঁবুর বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। আরও একটু যেতে বুঝলাম, অমিত। সে আমার চেহারা দেখে কিছু টের পেয়েছে, প্রশ্ন করে, 'তোমার কী হয়েছে ডাক্তার?'

- 'তোরা উঠে এলি না কেন?'

- 'গৌতমদার সঙ্গে তো সেরকম কথাই ছিল', অমিত আমার কাঁধ থেকে স্যাক আলগা করতে করতে বললে, 'তোমরা ওপরে উঠে গেলে মিংমা নেমে আসবে। তারপর আমরা তিন নম্বর ক্যাম্পে যাবো।'

গৌতম বা অমিত, যারই বোঝা কিংবা বোঝানোর ভুল হোক না কেন, ক্লান্ত শরীরে এই নিয়ে আলোচনা কিংবা তর্ক করতে ভালো লাগছিলো না। শ্রান্ত গলায় বললাম, 'প্রতিজ্ঞা করছি, ওয়াকি-টকি ছাড়া আর পাহাড়ে আসবো না।

কপাল ভালো, দু'নম্বর ক্যাম্পে তখনো লাঞ্চের খিচুড়ি অবশিষ্ট ছিল। আমি দু'তিন গ্রাস খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছি। আর কিছু মনে নেই। তপনের ডাকে যখন ঘুম ভেঙেছে, তখন বেশ রাত, 'স্যান্টোদা, খাওয়া-দাওয়া করে বিয়েবাড়ির লাইটিংটা দেখে যাও।'

- 'কার বিয়ে?'

- 'কামেট আর মানার।'

তাঁবুর বাইরে এসে দেখলাম, পূর্বি-কামেট বেসিনের ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে আতসবাজির খেলা। অগণিত তারা ও জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। দ্যুতিময় ছায়াপথটা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কষ্ট, ক্লান্তি অনেকটাই কেটে গেছে। আমি বললাম, 'বরযাত্রীদের খবরটা আগে নেওয়া দরকার।'

- 'হবে, সব হবে,' অমিত তাঁবুর ভেতর থেকে বলে, 'কালকের দিনটাও রেস্ট, পরশু সবাই মিলে ওপরে যাব।